# গঙ্গারিডি এবং উত্তরবঙ্গের ইতিকথা

রজত পাল

অরণ্যমন প্রকাশনী

# সূচিপত্র

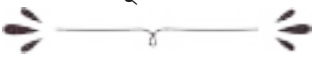


(ক) ভূমিকা পর্ব

১। ভূমিকা ৯
২। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক এলাকা ১২

(খ) গঙ্গারিডি পর্ব

৩। গঙ্গারিডি, না কি গন্ডারিডি? ২১
৪। গন্ডারিডির অবস্থান ৩১
৫। গৌড় ৩৭
৬। পালিবোথরা ও সান্ড্রাকোট্টাস ৪৪
৭। জাস্টিনের এপিটোম ও অশোকের শিলালিপি ৫৬

(গ) পৌরাণিক পর্ব

৮। পৌরাণিক কাহিনি ও তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ৬৮
৯। পাতাললোকের কথা ৭২
১০। কামরূপের পৌরাণিক ইতিহাস ৭৯

(ঘ) প্রাগৈতিহাসিক পর্ব

১১। বাণগড় ও মহাদেব শিব ৮৫
১২। বিরাট রাজার গড় ৯৩
১৩। উয়ারী-বটেশ্বর ৯৮
১৪। অসুরগড় ১০৪

(ঙ) কামরূপ-কামতাপুর পর্ব

১৫। ঐতিহাসিক কামরূপ ১০৯
১৬। কামরূপ-কামতাপুর ১১২
১৭। কামরূপে দশ সুলতানি আক্রমণ ১১৭

(চ) মহাস্থানগড় পর্ব

১৮। মহাস্থানগড় ১২৭
১৯। দুর্গের বিস্তারিত আলোচনা ১৩২

২০। দুর্গের বাইরের মহাস্থান ১৪২
২১। মহাস্থানলিপি ও পুণ্ড্রনগর ১৪৯
২২। পাণ্ডুয়া কি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন? ১৫৫

(ছ) অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্ব

২৩। গুপ্তসাম্রাজ্যের গুপ্তকথা ১৬৩
২৪। খালিমপুর তাম্রশাসন ও রাজা গোপাল ১৬৬
২৫। পালেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৭০
২৬। বাণগড়–প্রত্নতথ্য ১৭৩
২৭। পাহাড়পুর ১৮১
২৮। রামাবতী ও জগদ্দল মহাবিহার ১৮৭
২৯। চেদি রাজ্য ১৯১
৩০। ভিতরগড় দুর্গ ১৯৪
৩১। গৌড়ে মুসলিম শাসনের প্রথম পর্ব ১৯৮
৩২। রংপুর, জলপাইগুড়ি ২০১

# ভূমিকা পর্ব

# ।১।
# ভূমিকা

বাংলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে হলে যেমন অবিভক্ত বাংলা নিয়ে আলোচনা করতে হয়, তেমনই উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে হলে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উভয়ের উত্তরবঙ্গ নিয়েই আলোচনা করা জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের মালদা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের সঙ্গে তাই বাংলাদেশের দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, বগুড়া ইত্যাদি জেলাগুলির প্রসঙ্গও এসে পড়ে। দেশভাগের পরে উভয়ক্ষেত্রেই জেলাগুলিকে ভেঙে ছোটো ছোটো বহু জেলার জন্ম হয়েছে। সেসবের নাম আলাদা করে উল্লেখ করা হল না এখানে। দার্জিলিং পরে বাংলায় যুক্ত হয়েছে। সেটি আলোচনার বাইরে রাখা হল।

উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলে তিনটি বিষয় নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আলোচিত হয়ে থাকে। সেই তিনটি হল—

১। পালসাম্রাজ্যের আদিক্ষেত্র,

২। গৌড়কে কেন্দ্র করে সুলতানি শাসন, এবং

৩। রাজা গণেশের কথা

এই তিনটি বিষয় নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও আলোচনা অবশ্যই হবে। অনেক তথ্যই যেহেতু আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে তাই এই তিনটি বিষয় নিয়ে বিশদে আলোচনা করা থেকে আমরা এই গ্রন্থে বিরত রইলাম। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে পালসাম্রাজ্যের রাজধানী দিনাজপুর থেকে বিহারে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সুলতানি শাসন নিয়েও বহু গবেষণা হয়ে চলেছে। যেটুকু কম আলোচিত বলে আমাদের মনে হয়েছে বা প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে আমরা এই পুস্তকে আলোচনা করেছি। রাজা গণেশের অংশটুকু নিয়ে কিছু ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে। সেটি নিয়ে পৃথক গ্রন্থ হওয়া উচিত। আগামীদিনে এমন সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা করা হল না।

গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে গঙ্গারিডি নিয়ে কিছু ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রচলিত আলোচনার বাইরে থেকে যায়। আলেকজান্ডারের আগমনের সময়কালে বর্ণিত গঙ্গারিডি বলতে আসলে কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে সেই বিষয়ে আমাদের নিজস্ব কিছু ভাবনা রয়েছে। একটি বিশেষ আঙ্গিকের দিকে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি। এই আলোচনা প্রসঙ্গে মৌর্য রাজবংশের কাল নিয়ে কিছু কথা বলতে হয়েছে, যা উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত নয়।

পৌরাণিক এবং মহাকাব্যের কাহিনির মধ্যে ইতিহাসের উপাদান থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আমরা স্বীকার করি। স্থানীয় লোকবিশ্বাসের মধ্যেও অনেক সময় ইতিহাসের উপাদান থাকে। সেগুলিকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে না নিয়ে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাথে তুলনা করে ইতিহাসের সম্ভাবনার দিক তুলে ধরতে চেয়েছি। বাণগড় বা বিরাট রাজার গড় জাতীয় আলোচনায় এই সম্ভাবনার দিকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। মহাস্থানগড় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের অবস্থান নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছি। ইতিহাস নিয়ে গবেষণা থেমে থাকে না। বিগত কয়েক দশকে আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আমাদের সামনে উঠে এসেছে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা এই সহস্রাব্দের গবেষণাপত্রগুলির দিকে নজর রেখে আলোচনা করেছি।

মহাভারতের যুগে, এমনকি আলেকজান্ডারের আগমনের সময়েও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সেভাবে স্থলভূমিতে পরিণত হয়নি। ছোটো ছোটো দ্বীপের সমাহারে সেটি আসলে ছিল জলাকীর্ণ এক অঞ্চল। অনেকের মতে এই সময়ে সমুদ্র প্রায় রাজমহলের নিকট পর্যন্ত ছিল। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চলকে বাদ দিলে বাংলা বলতে উত্তরবঙ্গকেই ধরে নিতে হবে। বাংলার খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী ইতিহাস এই দুই অঞ্চলেই ছড়িয়ে রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাণ্ডু রাজার ঢিবির মতন উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড় বা বাণগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস প্রাক-মৌর্যযুগের। এর অর্থ এ নয় যে চন্দ্রকেতুগড়ের মতন এলাকা প্রাচীন নয়। কিন্তু সেগুলি সেদিনের বিচারে দ্বীপময় অঞ্চল। এমনই এক দ্বীপে ছিল কপিলমুনির আশ্রম, যা আজকের সাগরদ্বীপের অনেকটাই উত্তরে অবস্থিত ছিল বলে অনেকের অনুমান।

দক্ষিণবঙ্গ আমাদের এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয় নয়। আজকের পদ্মানদীর উদ্ভব ঠিক কবে হয়েছিল সে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এই শাখানদী যে আদিতে গঙ্গার মূলধারা ছিল না, সে-বিষয়ে বহু গবেষণাগত প্রমাণ রয়েছে। তবে পদ্মার উত্তরে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম কুল পর্যন্ত আমাদের আলোচিত উত্তরবঙ্গ। এই অঞ্চলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তিন নদী হল প্রাচীন ত্রিস্রোতার তিনধারা। করতোয়া, পুনর্ভবা এবং আত্রেয়ীর তীরে ছিল সেদিনের বাংলার নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বাণগড় এবং মহাস্থানগড়ের অবস্থান এই নদীগুলির তীরেই।

কামরূপকে আমরা আসামের প্রতিরূপ বলে মনে করে থাকি সাধারণত। কিন্তু প্রায় সুলতানি যুগ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল কামরূপের সীমানা। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের তাই কামরূপের কথা বলতে হয়েছে। কামরূপ থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা কামতাপুরও এসেছে আলোচনায়।

মহাভারতে এবং ভাগবতে উল্লিখিত পৌণ্ড্র বাসুদেব, পুণ্ড্রবর্ধন তথা উত্তরবঙ্গের একাংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে দ্বারকা পর্যন্ত বাহিনী নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। মহাকাব্যের কাহিনি বলে একে যদি স্বীকার না-ও করি, মহাবীর জৈনের অনুগামী পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয় শাখা এই অঞ্চলেই ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জৈনগুরু ভদ্রবাহু এই অঞ্চলে জন্ম নিয়েছিলেন। জৈন মন্দিরকেই সংস্কার করে পাহাড়পুরে সোমপুর বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয়েছিল বলে একটি মত আছে। এই বিহারটি নালন্দা বা বিক্রমশীলের সমতুল বিখ্যাত ছিল।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন নন্দ রাজবংশের উৎপত্তি উত্তরবঙ্গে হয়েছিল। এ-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাইনি বলে কিছু আলোচনা করা হল না। তবে গুপ্ত রাজবংশ যে উত্তরবঙ্গ থেকে শ্রীগুপ্তের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল সে আলোচনা করেছি।

ইতিহাস নিয়ে স্বাভাবিক আগ্রহ আমাকে এই বিষয়ে লেখায় উৎসাহী করেছে। যেভাবে যে ইতিহাসকে আমরা প্রামাণ্য বলে মেনে থাকি তার মধ্যে নানান অসম্পূর্ণতা রয়েছে বলে অনেক সময় মনে হয়েছে। সেই গলদগুলিই সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি। অনেক সময় সম্ভাব্য বিকল্প পাঠও তুলে ধরেছি। এমন কখনোই দাবি করা হয়নি যে আমাদের বিকল্প পাঠটিই একমাত্র সত্য। বরং চেয়েছি আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলি নিয়ে আপনারা ভাবুন। তারপর নিজে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিন। ইতিহাস হল আমার আপনার পূর্বপুরুষদের অতীত। সেই অতীতের কথা জানার, সে-বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার সকলের রয়েছে। বাঙালির ছিল অতীত গৌরবময় অধ্যায়। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে আমাদের এই আলোচনা বাঙালিকে এই অঞ্চলের গৌরবময় অতীত নিয়ে আগ্রহী করে তুলবে এই আশা পোষণ করছি।

# ।২।
# উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক এলাকা

Figure 1-1: Map of Bengal

Collected from: www.songramernotebook.com

Thus the eastern half of the province remained hydrologically 'active' while the

আগেই বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গ বলতে অবিভক্ত বাংলার উত্তরবঙ্গকে আমাদের বিচারে আনতে হবে। আজকের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের সাথে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলাকে মিলিয়ে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা। পালসাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল এখানে। সম্রাট গোপালের জন্মস্থান চূড়ামণি ছিল এই জেলায়। প্রাচীন কোটিবর্ষ এই জেলাতেই অবস্থিত।

পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা এবং তার পূর্বদিকে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা উত্তরবঙ্গ তথা বরেন্দ্রভূমির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বাংলাদেশের পাবনা ও বগুড়া জেলা বরেন্দ্রর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বগুড়াতে আবিষ্কৃত হয়েছে 'পুণ্ড্রনগর' নামে দুর্গ, যা আজ মহাস্থানগড় নামে পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা আদিতে ছিল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। বাংলাদেশের রংপুর জেলা ছিল সেই কামরূপের সীমানার মধ্যে। কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুরকে তাই আমাদের উত্তরবঙ্গ নিয়ে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া ইত্যাদি জেলা ভেঙে অনেকভাগে বিভক্ত হয়েছে। পঞ্চগড়, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি জেলাগুলিকে আলাদা করে উল্লেখ করার তাই প্রয়োজন হয়নি। এগুলি পুরাতন জেলাগুলির সীমানার মধ্যেই অবস্থিত।

উত্তরবঙ্গের সীমানা বলতে আমাদের আলোচনায় দক্ষিণে পদ্মা, উত্তরে হিমালয়, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে গঙ্গা ও কোশী নদীকে ধরা হয়েছে। নানা ভৌগোলিক পরিবর্তনের কারণে উত্তরবঙ্গের নদ-নদীগুলির গতিপথ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। কোশী নদী একসময় সোজা পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিলিত হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই নদী দক্ষিণদিকে এসে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। এটিই উত্তরবঙ্গের উত্তরদিকের পশ্চিমসীমা। ত্রিস্রোতা নদী একসময় তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পুনর্ভবা, আত্রেয়ী ও করতোয়া নাম নিয়ে প্রবাহিত হত। এই তিন নদীর তীরে বহু গুরুত্বপূর্ণ বসতি গড়ে উঠেছিল একদা। বাণগড় বা দেবকোট, মহাস্থানগড় এদের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ। অষ্টাদশ শতকে ভয়াবহ বন্যায় তিনটি নদীর গতিপথেই বড়ো পরিবর্তন ঘটে। ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নিজে সরাসরি ব্রহ্মপুত্রে এসে মিলিত হয়। ফলে, এর তিনটি ধারাই স্থানীয় নদীতে পরিণত হয়। সারা বছরে বরফগলা জলের অভাবে নদীগুলির পুরাতন প্রভাব লুপ্ত হয়। এই নদীগুলির মাধ্যমে নিয়মিত বাণিজ্যের যে পথ, সেটি রুদ্ধ হয়ে যায়। বড়ো বড়ো নাগরিক কেন্দ্রগুলির পতন ঘটে। ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়ে যায়।

## তিন বিখ্যাত নদীর কথা

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত নদী ছিল সভ্যতার প্রতীক। বিশ্বের সব সভ্যতাই নদীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠত। নদী দিত জল, যে জল পান করা, কৃষিকাজ করা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন গৃহকর্মে নিত্যব্যবহৃত হত। সেই জলের প্রয়োজন কূপ বা পুষ্করিণী খনন করে অনেকটাই সাধিত হলেও নদী করে দিত যোগাযোগের পথ। দূর থেকে দূরে নদীপথে সহজেই যাতায়াত করা যেত। রেল বা মোটর আবিষ্কারের আগে একস্থানের সাথে অন্যস্থানের পণ্যের আদানপ্রদানের জন্য নদীপথের থেকে উত্তম মাধ্যম আর কিছুই ছিল না। গো-শকট বা ঘোড়ার গাড়ি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য উপযোগী নয়। উপরন্তু বনজঙ্গল পাহাড় কেটে সেই পথ তৈরি করা ছিল সময়সাপেক্ষ এবং সেগুলিকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন পড়ত।

এত রকম ভাবনার দরকারই পড়ত না নদীপথের ক্ষেত্রে। তার ওপরে যদি নদীটি হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট হত, তাহলে সারা বছরের জন্য নিষ্কৃতি। ভারতের

মতন দেশে নদী তাই মায়ের রূপে পূজিতা। গঙ্গা, যমুনা কিংবা হারিয়ে যাওয়া সরস্বতী তাই দেবী। এমনকি বরফগলা জল না পেয়েও নর্মদা, কাবেরী, গোদাবরী দেবী। এমনই পূজিতা তিন নদী উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে জড়িয়েছিল একদিন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই তিন নদীর প্রায় মৃত্যু হলে তাদের তীরে গড়ে ওঠা নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিরও পতন ঘটেছিল। খুব সংক্ষেপে তাদের কথা জেনে নেব।

***

*'অপভিতৌ গঙ্গাকরতোয়া নর্ঘ প্রবাহ পুণ্যয়তমাম্*
*অপুণর্ভবা অয় মহাতীর্থ বিকলু পৌজ্জ্বলামন্তঃ।।*

— রামচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দী

**করতোয়া :** বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী ডিভিশনের এক নদী। অধুনা নদীটি ছোটো হলেও অতীতে এটি ছিল এক বিশালকায় নদী। 'সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন' মতে এই নদী বখতিয়ারের সময়ে গঙ্গার তিনগুণ চওড়া ছিল।

এই নদী একদা গঙ্গা-নর্মদার মতই পবিত্র ছিল, যার তীরে গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রনগর এবং শ্রাবস্তী নামে দুই নগর।

কর (হাত) + তোয়া (জল) = করতোয়া

পার্বতীকে বিবাহের পরে শিবের হাত থেকে এই নদীর উৎপত্তি বলে লোকপ্রবাদ অনুসারে এই নামকরণ হয়েছিল। করতোয়াকে একসময় 'পুণ্যতোয়া'-ও বলা হত।

এই নদী ছিল একদা পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্বসীমা। দিনাজপুর এবং রাজশাহীর সীমানায় এই নদীর অবস্থান ছিল। ১৬৬০ সালের ভ্যান ডেন ব্রুক-এর মানচিত্র অনুসারে করতোয়া নদী পদ্মাতে এসে মিলিত হত। অতীত ত্রিস্রোতার এক স্রোত ছিল করতোয়া। অপর দুই স্রোতের নাম ছিল আত্রেয়ী/আত্রাই ও পুনর্ভবা। রেনেলের মানচিত্রে ত্রিস্রোতার এই তিনটি শাখাই দেখানো হয়েছে।

করতোয়ার উৎপত্তি হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে। ১৭৮৭ সালের বিধ্বংসী ভূকম্প ও বন্যার পরে ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীর ধারার বদল ঘটে এবং তিস্তা পূর্বদিকে সরে আসে। করতোয়ার খাতটি রয়ে যায় এবং বৃষ্টির জলে পুষ্ট হয়ে বেঁচে থাকে। এরপর থেকেই করতোয়ার ধারা ছোটো হয়ে যায় এবং বর্তমানে এটি একটি ক্ষুদ্র এক নদী। আধুনিক জলপাইগুড়ি জেলাতে এই নদীর ধারা এখনও রয়েছে। মাঝেমধ্যে হারিয়ে গেলেও দক্ষিণে বাংলাদেশের বগুড়া জেলা পর্যন্ত এর ক্ষীণধারাটির অস্তিত্ব রয়েছে।

করতোয়া নদীর নামে 'করতোয়া মাহাত্ম্য' রচিত হয়েছিল মধ্যযুগে। করতোয়াকে 'পৌণ্ড্রগণের নিত্যপ্লাবনকারিণী' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনের নাম 'মহাস্থান' বলা হয়েছে।

রংপুরের জাগের গানে বলা হয়েছে,

*করতোয়া শিবের বিভার হস্তজল*
*মধ্য দিয়া বয়া যায় কবি টলটল*
*করতোয়ার তীরে আছে শীলাদেবীর ঘাট*
*পরশুরামের আছে সেখানেতে পাঠ*
*পৌষ মাসে হয় যদি নারায়ণী যোগ*
*শতেক যোজন হতে আইসে কত লোক।।*

মহাভারতে করতোয়া নদীর উল্লেখ রয়েছে। বনপর্বে ৮৫তম অধ্যায়ে লেখা হয়েছে,

*করতোয়া সমাসাদ্য তিরাত্রো পোষিত নরঃ*
*অশ্বমেধ মবাপ্নোনিত প্রজাপতি কৃত্যে বিধিঃ*

— তিনদিনের উপবাসের পরে করতোয়া যাত্রা করলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়।

'অমরকোষে' করতোয়াকে 'সদানীরা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

*করতোয়া সদানীরে সরিৎ শ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুত।*
*পৌণ্ড্রান্ প্লাবরসে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে।।*

স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্রেও এই নদীর উল্লেখ রয়েছে।

করতোয়ার দৈর্ঘ্য ৫৯৭ কি.মি.। এই নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছিল এককালের পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী 'পুণ্ড্রনগর', যাকে মহাস্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্থানটির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আমরা করব।

পৌষমাসে বিশেষ নারায়ণী তিথিতে 'বারুণী' স্নানের জন্য করতোয়া বিখ্যাত।

ঘোড়াঘাট – করতোয়া নদীর তীরে এই অঞ্চলটি অবস্থিত ছিল। কিংবদন্তি হল এই অঞ্চলে মহাভারতের সময়ের বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল। ঐতিহাসিক যুগেও এই অঞ্চলের খ্যাতি ছিল। এর নিকটেই রয়েছে ডোমার নামক বাণিজ্যকেন্দ্র।

সীতাকোট – চরকাই রেলস্টেশনের ১১ কি.মি. পূর্বদিকে করতোয়ার একটি পরিত্যক্ত খাতের ওপর নবাবগঞ্জ নামক গ্রামে একটি ইটের ভগ্নস্তূপ এখনও দেখা যায়। স্থানীয়রা সীতাকোট বলে চিহ্নিত করে একে। এর নিকটেই করতোয়া নদীতে রয়েছে তর্পণ ঘাট। কিংবদন্তি হল রামায়ণের বাল্মীকি এই ঘাটে স্নান ও তর্পণ করতেন। রামকে ত্যাগ করে সীতা যে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন বলা হয়, সেই পাতাল মাটির

নিচের অঞ্চল নয়। বাংলা যে পৌরাণিকযুগে 'পাতাল' বলে পরিচিত ছিল সে-কথা আমরা পরে আলোচনা করব। লোকবিশ্বাস হল, লক্ষ্মণ এখানে সীতাকে ছেড়ে যান রামের আদেশে।

শেরপুর – এই অঞ্চল শক্তি মহাপীঠের জন্য বিখ্যাত ছিল একসময়। এই স্থানের পূর্বনাম ছিল 'ভাবতা'। এর পাশ দিয়েই বয়ে যেত করতোয়া নদী। বর্তমানের করতোয়ার খাত ৬ কি.মি. দূরে সরে গিয়েছে।

**পুনর্ভবা :** বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত নদী এটি। ত্রিস্রোতা বা তিস্তার এক ধারা পুনর্ভবা। ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্প ও বন্যার পরে এই নদীর পার্বত্য উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, এই নদীটিও করতোয়ার মতই ছোটো এক নদীতে পরিণত হয়ে যায়। বর্তমানে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থেকে এই নদীর খাত শুরু হয়েছে। এই নদীর তীরেই ছিল বিখ্যাত 'বাণগড়', যা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

**আত্রাই নদী :** মহাভারতে এই নদীর নাম রয়েছে। শিলিগুড়ির ১০ কি.মি. উত্তর-পূর্বে এর উৎপত্তি বর্তমানে। নদীটি কিছুটা ভারতে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। দৈর্ঘ্য ৩৮০ কি.মি.। বাংলাদেশের চলনবিল হয়ে যমুনাতে পড়েছে। পুনর্ভবা এর উপনদী বর্তমানে।

অদ্ভূতাচার্য্যের রামায়ণে পাওয়া যাচ্ছে,

*আত্রাই-এর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সমান।*
*মহাপূন্যস্থান সেই পুরাণে ব্যাখ্যান।।*
*করতোয়া পশ্চিমভাগে জাহ্নবীর সীমা।*
*হেন পুণ্যস্থান সেহি নাহিক উপমা।।*
*করতোয়ার পশ্চিমে আত্রাইর উত্তরকুলে*
*মহাপূন্যস্থান সেই পুরাণেতে বলে।।*

পুণ্যতোয়ারূপে আত্রেয়ী বা আত্রাই নদীর যে অতীতে বিশাল মর্যাদার আসন ছিল তার প্রমাণ আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাই। দুর্গাপূজার মহাস্নান মন্ত্রে বলা হয়েছে,

*ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।*
*সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।।*
*ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা*
*সর্ব্বাঃ সুমনসো ভুত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুস্তস্তাঃ।।*